নির্বাচন পদ্ধতি সংস্কার ও প্রযুক্তির সম্পৃক্ততা

সাম্প্রতিককালে রাজনীতির প্রধানতম আলোচ্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে নির্বাচন পদ্ধতির সংস্কার। সেই সংস্কারের অংশ হিসেবে নির্বাচন কমিশন প্রহসনমূলক, রঙ্গ-রসিকতার সংলাপও শুরু করেছে। এদেশে বুদ্ধিহীন ইডিয়টদের হাতে ক্ষমতা কিভাবে দেয়া হয় তার প্রমাণ হচ্ছে এই সংলাপ। প্রধান নির্বাচন কমিশনার ভোটার তালিকা হাল-নাগাদ করা হবে নাকি নতুন করে করবেন তার জন্য রাজনৈতিক দলগুলোর মতামত নিচ্ছে। খবরের কাগজে এই সংলাপকে এরই মাঝে একটি অকার্যকর হাস্য-রসাত্মক ঘটনা বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। অথচ এই কাজটি মতামতের উপর নির্ভরশীল নয়। আইনানুগভাবে প্রতিটি জাতীয় নির্বাচনের আগেই হালনাগাদ বা নতুন করে ভোটার তালিকা প্রস্তুত করা হয়। এটি কোন রাজনৈতিক দল চাইলো কি চাইলো না তার উপর নির্ভর করেনা। আমি খুব অবাক হলাম এটি পড়ে যে প্রধান নির্বাচন কমিশনার যিনি একজন বিচারপতিও, তিনি মনে করছেন বেশীরভাগ রাজনৈতিক দল যা চাইবে তার উপর ভিত্তি করে তিনি সিদ্ধান্ত নেবেন। শুধু মাত্র এই একটি ঘটনাতেই তিনি প্রমাণ করলেন যে, একটি জাতীয় নির্বাচনতো দূরের কথা, ওয়ার্ডের নির্বাচন করার দক্ষতা বা যোগ্যতা এই লোকটির নেই।

যাহোক, যেহেতু তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থাটি নির্বাচনেরই অংশ, সেহেতু তত্ত্বাবধায়ক সংস্কার নিয়েও কথা উঠেছে। তবে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের চাইতে অনেক বেশি গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে নির্বাচন পদ্ধতি সংস্কারের উপর।

এরই মাঝে আওয়ামীলীগের নেতৃত্বাধীন ১৪ দল তাদের ৩১ দফা সুপারিশমালা পেশ করেছে। সরকারী দল নানা প্রকারের কথাবার্তা বললেও এইসব সুপারিশমালা নিয়ে কথা বলতে তাদের কোন আপত্তি আছে বলে মনে হয় না। মান্নান ভুইয়া বা ব্যানা হুদার কথা থেকে বিষয়গুলো পরিষ্কার হয়ে উঠেছে। এসব বিষয়ে নির্বাচন কমিশনেরও প্রস্তাবনা রয়েছে। বর্তমান ও অতীতের নির্বাচন কমিশনারগণও নির্বাচন পদ্ধতির সংস্কারের বিষয়ে তাদের প্রস্তাবনা পেশ করে গেছেন।

আমরা যারা অন্ততঃ ৭০ সাল থেকে এদেশের নির্বাচনসমূহ দেখে আসছি তারা অবশ্যই সকল ভালোর পক্ষে। কিন্তু আমাদের দেশে সকল ভালো কখনোই সকল সময়ে হয়ে উঠেনা। ফলে সকল ভালো থেকে আমাদেরকে কিছু ভালো বাছাই করতে হয়। আমার অভিজ্ঞতা থেকে সেইসব কিছু ভালোর প্রতি সকল মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারি।

ক) <u>তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সংস্কার</u>

স্বদেশ স্বকাল

যদিও অনেকেই এই প্রশ্ন তুলেছেন যে, তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা নয়, তবুও আমাদের মতো দেশে এই ব্যবস্থাটি নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য নির্বাচিত সরকারের চেয়ে ভালো।

আমাদের দেশের অভিজ্ঞতা হলো, যে সরকারের অধীনে নির্বাচন হয় সেই সরকার যদি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে তবে নির্বাচন নিরপেক্ষ হতে পারেনা। ৭০ সালে ইয়াহিয়া খান নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলে আওয়ামী লীগ কখনোই নির্বাচনে জিততে পারতোনা। আয়ূব খান, জিয়াউর রহমান, হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ এরা কেউ অন্যকে নির্বাচনে জিততে দেননি। আমাদের দেশের শতকরা ৯০ জন লোককে যদি জিজ্ঞেস করা হয় তবে তারা এটি অবশ্যই বলবেন যে, আজকের ক্ষমতাসীন জোট সরকারও তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে জিততে দেবেনা- দেশের মানুষ যাকেই ভোট দিক না কেন, ক্ষমতায় তারাই ফিরে আসবে। নির্বাচনের ফলাফল জেলার ডিসি অফিসে প্রস্তুত হবার ঘটনা কি একটি আছে? শত শত হাজার হাজার কেন্দ্রের ফলাফল ইচ্ছেমতো কাগজে লিখে দিয়ে প্রস্তুত করার কৃতিত্ব আমাদের ডিসি সাহেবদের রয়েছে। এই কাজটি তারা একবার নয় বহুবার করেছেন।

সুতরাং তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতাসীন দলীয় সরকারের দলবাজির চাইতে ভালো। কিন্তু তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বড় দুর্বলতা হচ্ছে যে এর পেছনে কোন রাজনৈতিক সংগঠন নেই। এটি তাদের সবলতাও। কারণ তাদেরকে দলীয় ক্যাডার পালন করতে হয়না। কিন্তু তত্ত্বাবধায়ক সরকারের যেসব সমস্যার কথা আমাদের বিরোধীদলগুলো উল্লেখ করেছে তার চাইতেও বড় সমস্যা হচ্ছে প্রশাসন। আমার নিজের চিন্তায় আগামী নির্বাচনে কেবল তত্ত্বাবধায়ক সরকার বা রাষ্ট্রপতির হাতে সেনাবাহিনীর দায়িত্ব নিয়েই সমস্যায় থাকবেনা। বর্তমান ক্ষমতাসীন জোট প্রশাসনকে এমনভাবে দলীয়করণ করে যাচ্ছে যে, তত্ত্বাবধায়ক সরকার কোনভাবেই একটি তথাকথিত নিরপেক্ষ প্রশাসন দাঁড় করাতে পারবেনা। বরং আগামী নির্বাচনে বিরোধীদলকে বিএনপির জোট এবং বিএনপির প্রশাসন দুয়ের সাথেই লড়াই করতে হবে।

সম্প্রতি অনুষ্ঠিত চট্টগ্রাম পৌরসভার নির্বাচনে আমজাদ সাহেব যে ভূমিকা পালন করেছিলেন, আগামী নির্বাচনে তেমন অসংখ্য আমজাদ পাওয়া যাবে। জোট সরকার যে পুলিশ বাহিনী, বিডিআর এবং র‍্যাব রেখে যাবে তাদের ভূমিকা কি হবে সেটিও খুব সহজেই আন্দাজ করা যায়।

কোন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পক্ষেই তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত ছড়িয়ে থাকা দলীয়করণকে সম্পূর্ণভাবে নিরপেক্ষ করা সম্ভব হবেনা। এর সাথে যদি সেনাবাহিনীর কোন অংশকে দলীয় সুবিধায় কেউ ব্যবহার করে তবে তথাকথিত

নিরপেক্ষ নির্বাচন স্বপ্নই থেকে যাবে। নির্বাচনে ডিসি সাহেবরা যে ফলাফল তৈরী করতে সিদ্ধহস্ত তা আমরা এর আগে বহুবার দেখেছি। এবারের নির্বাচনে এই কাজে অতীতের সেইসব সকল রেকর্ড ভঙ্গ হতে পারে। আমি ঠিক জানিনা, এই মহাসমস্যা থেকে উত্তরণের উপায় কী? আমাদের পুরো দেশটাই কার্যত (সাবেক) ভিসি আফতাবের জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে গেছে। ফলে সেখানে একজন ভালো মানুষের পক্ষেও রাতারাতি অবস্থার পরিবর্তন করা সম্ভব হবেনা। জোট সরকার যে চরম দলীয়করণ করে যাচ্ছে, মাত্র তিন মাস সময়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকার তা কেমন করে বদলাবে? আসলে দলীয়করণ সনাক্ত করতে করতেই তাদের ৯০ দিন চলে যাবে।

যাহোক, তবুও আমরা প্রত্যাশা করতে পারি যে, দক্ষতা, নিরপেক্ষতা ও সদিচ্ছা নিয়ে একটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সরকারও কিছু না কিছু উপায় বের করতে পারবে।

নির্বাচন পদ্ধতি ও কমিশন

তবে বর্তমান ভোটার তালিকা, নির্বাচন কমিশন ও ভোট গ্রহণের বিপ্লবী পরিবর্তন না করলে কোনভাবেই নিরপেক্ষতা তো দূরের কথা একটি স্বাভাবিক নির্বাচনও অনুষ্ঠান করা সম্ভব নয়।

বিদ্যমান ভোটার তালিকায় যদি ছবি যুক্ত করা না হয় অথবা যদি ছবিসহ পরিচয়পত্র যদি না থাকে তবে তথাকথিত অনপনেয় কালির ছাপ দিয়ে ভোটার চিহ্নিত করা মোটেই সম্ভব নয়। এই পদ্ধতিতে জাল ভোট প্রদান একটি সহজতম পথ। এটি পোলিং এজেন্ট দিয়ে প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়। প্রকৃতপক্ষে একটি উন্নত ভোটিং পদ্ধতি ডিজিটাল করা যেতে পারে। এতে ভোটিং মেশিন প্রচলন করা যায়। অনলাইন ভোটিং ব্যবস্থাও চালু করা যায়।

তবে জোট সরকারের পুরো মেয়াদ শেষ করে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলেও অবশিষ্ট সময়ের মাঝে অনলাইন ভোটিং, ডিজিটাল ভোটিং বা ভোটিং মেশিন প্রচলন করা সম্ভব হবেনা। তবে ছবিসহ ভোটার তালিকা বা ছবিসহ পরিচয়পত্র প্রদানের কাজটি সম্পন্ন করা যায়। আমাদের নতুন নির্বাচন কমিশনার বিভাগীয় শহরগুলোতে পরিচয় পত্র দানের ব্যাপারে প্রস্তাব করেছেন। কিন্তু তিনি তাও করতে পারবেন না। কারণ সাইফুর রহমান বাজেটে এজন্য কোন বরাদ্ধ রাখেননি। আজিজ সাহেবকে এজন্য বরাদ্দ দিতে দিতে তিনি পুরো বছরটাই হয়তো পার করে দেবেন। যখন আজিজ সাহেব টাকা পাবেন তখন নির্বাচন শেষ হয়ে যাবে।

কিন্তু আজিজ সাহেব ডিজিটাল ক্যামেরায় ছবি তোলে কম্পিউটারে ভোটার তালিকা প্রস্তুত করে ছ□মাসেই একটি সঠিক ভোটার তালিকা প্রণয়ন করতে পারেন। এই একটি ভোটার তালিকা প্রস্তুত হবার পর পরবর্তীতে ভোটার তালিকা

কেবলমাত্র হালনাগাদ করলেই চলবে। এছাড়া কোনমতেই নির্বাচনকে গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে নেয়া যাবেনা।

উপরন্তু নির্বাচন কমিশনকে স্বাধীন করে নির্বাচন সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তাকে হায়ার ও ফায়ার করার ক্ষমতা নির্বাচন কমিশনের হাতে থাকলে এবং একটি দল নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশন প্রতিষ্ঠিত করতে পারলে নির্বাচনকে একটি গ্রহণযোগ্য মাত্রায় নিয়ে আসা যাবে।

তবে পুরো ব্যাপারটিতেই একটি বিশাল প্রশ্ন থাকবে- বিড়ালের গলায় ঘন্টা বাধবে কে? বস্তুত পুরো প্রক্রিয়াটিতে সংস্কার, পরিবর্তন বা পরিবর্ধন যাই হোক না কেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নেতৃত্ব কে দেবেন, উপদেষ্টাগণ কারা হবেন, প্রধান নির্বাচন কমিশনার কি ভূমিকা নেবেন এবং তার সহযোগী কমিশনারগণ কি ভূমিকা নেবেন তার উপর ব্যাপকভাবে নির্ভর করবে ফলাফল।

আমি জানিনা, নয় মন ঘি হবে কিনা, আর রাধাও নাচবে কিনা?

নির্বাচন ও তথ্যপ্রযুক্তি

বেশ কিছুদিন ধরেই আমাদের দেশের বিরোধীদলসমূহ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার পাশাপাশি নির্বাচন ব্যবস্থার সংস্কারের দাবীও জানিয়ে আসছেন। পত্র-পত্রিকায় বা ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রকাশিত বিরোধীদলীয় এইসব দাবীনামা দেখে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে, বিরোধীদল নির্বাচনের বাইরের দিকটা যেমনভাবে দেখছে, এর সাথে সম্পৃক্ত ভেতরের দিকটা সেভাবে দেখছেনা।

কোন সন্দেহ নেই, বর্তমান পদ্ধতিতে নির্বাচনে প্রশাসনকে ব্যবহার করার সুবিধাটি জেতার জন্য (কিংবা জালিয়াতির জন্য) সর্বাধিক সুফল দেয়। এর পাশাপাশি টাকা এবং অস্ত্র ব্যবহৃত হতে পারলে নির্বাচনে জয়ী হওয়া প্রায় নিশ্চিত। যারা এসব ক্ষমতা কাজে লাগাতে পারেন না তারা সংস্কার দাবী করবেন- এটাই স্বাভাবিক। হয়তো সেজন্যই আমাদের বিরোধীদলগুলো তাদের মতো করে এই প্রক্রিয়ায় সংশোধনী আনার জন্য আন্দোলন করে যাচ্ছে। অন্যদিকে এইসব হাতিয়ার ব্যবহার করার সকল ক্ষমতা বা দক্ষতা বর্তমান সরকারী জোটের আছে বলে তারা এই ব্যবস্থার পরিবর্তন চায়না। এরা আসলে কোনটাই স্বাভাবিকভাবে করতে চায়না। তারা সংবিধানে তত্ত্বাবধায়ক সরকার পদ্ধতি কেমন করে সংযোজন করেছিলো তা আমাদের স্মৃতি থেকে হারিয়ে যায়নি। সুতরাং সংবিধান সংশোধন করা যাবেনা এসব কথাবার্তায় কান না দিয়েই বিরোধীদলকে নির্বাচন ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার সংস্কার নিয়ে আন্দোলন করতে হবে।

চারদলীয় জোট সরকারের প্রধানমন্ত্রী ও আইন মন্ত্রীসহ সকলেই বলছেন, সংবিধান সংশোধন করা যাবেনা। ভাবটা এমন যে, সংবিধান নামক এই পবিত্র দলিল হাজার

বছর যাবত পরিবর্তনহীন রয়ে গেছে এবং কুমারী কন্যার মতো তার কিছুই স্পর্শ করা যাবেনা। অথচ আমরা জানি, প্রয়োজন তো বটেই, অপ্রয়োজনেও এই সংবিধান বারবার পরিবির্তিত হয়েছে। শুধুমাত্র সংবিধানের তিলক হিসেবে বিসমিল্লাহ সংযোজন বা রাষ্ট্রধর্ম নামক সোনার পাথর বাটি খোজাসহ নানা অজুহাতে সংবিধানের সংশোধনী আনা হয়েছে।

কার্যত যে মূল নীতি ও আদর্শকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশ তৈরি হয়েছিলো, ৭২-এর সংবিধানে যার প্রতিফলন ছিলো তা-কি এখন আর আছে?

সুতরাং সংবিধানের কোন একটি সংশোধনীর দাবী মোটেই অসঙ্গত নয়। তবে আমি মনে করি, শুধুমাত্র সংবিধান সংশোধন করে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার বা নির্বাচন কমিশনের সংস্কার করলেই নির্বাচন নিরপেক্ষ হবেনা। এই সময়ে নির্দলীয় সরকার প্রধান সেনাবাহিনী নিয়ন্ত্রণ করলে রকমফের হয়তো কিছুটা হবে- কিন্তু নির্বাচনের মূল ত্রুটি এর অনুষ্ঠিত হবার প্রক্রিয়ায়- যার অনেকটাই তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের মধ্য দিয়ে সঠিকভাবে করা যেতে পারে। বিশ্বের প্রায় সকল উন্নত দেশে- এমনকি আমাদের পাশের দেশ ভারতবর্ষেও তথ্যপ্রযুক্তি নির্বাচন কাজ সুষ্ঠুভাবে করার জন্য ব্যবহার করা হয়। আমি মনে করি, নির্বাচন প্রক্রিয়াকে সঠিক করার জন্য আমাদের দেশের রাজনীতিবিদগণ একবার ভেবে দেখবেন তথ্যপ্রযুক্তিকে এই কাজে ব্যবহার করা যায় কিনা।

যেসব ক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তি নির্বাচনকে সুষ্ঠুভাবে করার ক্ষেত্রে সহায়তা করতে পারে সেগুলো হলো :

ক) ডিজিটাল ভোটার লিস্ট

খ) জাতীয় পরিচয় পত্র

গ) ভোটিং মেশিন

ঘ) নির্বাচন পরবতী সমন্বয়- জবাবদিহিতা

বাংলাদেশে এসব কাজ শুরু হয়েছিলো আরো এক যুগ আগে। এরশাদের আমলে ভোটার তালিকা মুদ্রণের কাজ করতে গিয়ে কম্পিউটারের সাথে নির্বাচন কমিশনের দেখা হয়। সেই সময়ে আমরা প্রস্তাব করেছিলাম যে, কেবল কাগজে না ছেপে ভোটার তালিকার একটি ডিজিটাল ডাটাবেজ তৈরি করা হোক। এই ডাটাবেজ দ্বিতীয়বার ডাটাএন্ট্রির ব্যয় বাচানো ছাড়াও একটি অনলাইন ভোটার তালিকা প্রকাশ, ভোটিং ব্যবস্থার জবাবদিহিতা, জাতীয় পরিচয়পত্র এবং ডিজিটাল মেশিনের সাহায্যে ভোট গ্রহণের পথকে সুগম করবে।

কিন্তু তৎকালীন নির্বাচন কমিশনার আমাদের প্রস্তাব বিবেচনা তো করেনইনি, লেটারপ্রেসে ভোটার তালিকা প্রস্তুত করার সিদ্ধান্ত নেন।

এরপর নির্বাচন কমিশনে পরিচয়পত্রের ঢেউ উঠে। বিচারপতি রউফ সাহেব পরিচয়পত্র নিয়ে মহাযজ্ঞ করেন। এমনকি পাইলট প্রকল্প হিসেবে পরিচয় পত্র দিয়ে নির্বাচনও করেন। কোটি কোটি টাকা বুড়ীগঙ্গায় ফেলে দিয়ে রউফ সাহেব এবং পরিচয়পত্র প্রকল্প চিরশায়িত হয়ে পড়ে। এ বিষয়ে বিদেশী সংস্থাসমূহও চরম বিভ্রান্তিকর উপদেশ প্রদান করে। তাদের পরামর্শ এখনো নির্বাচন কমিশনের শক্তিশালীকরণ চরম বিশৃঙ্খলভাবে চলছে।

অথচ একটি মাত্র প্রকল্পের অধীনে আদমশুমারী করার সময় বা আলাদাভাবে দেশের সকল নাগরিকের জন্য একটি করে ফরম পূরণ করা যেতে পারে। নির্বাচন কমিশন অতি সহজভাবে সেই ফর্মটি নির্ধারণ করতে পারে। এতে নাম, পিতার নাম, মাতার নাম, জন্ম তারিখ, রক্তের গ্রুপ, ঠিকানা, স্বাক্ষর/ টিপসই এবং ছবি থাকতে পারে। কাগজের মাধ্যমে এই ফরমগুলো ইউনিয়ন পরিষদ প্রস্তুত করতে পারে। নির্বাচন কমিশন ডিজিটালি এই ফরমগুলো পূরণ করতে পারে। কমিশনের কর্মচারীরা একটি ক্যামেরা সম্বলিত পিডিএ-র মাধ্যমে এই তথ্যগুলো সংগ্রহ করে নিতে পারেন। হাতে বহনযোগ্য পিডিএ, পামটপ স্মার্টফোন বা সাধারণ মোবাইল ফোনে বাংলা ভাষার ব্যবহারসহ সকল তথ্যই ধারণ করতে পারবে। দ্রুত টাইপ করার সুবিধার্থে পিডিএ/পামটপ বা স্মার্টফোনে ছোট কীবোর্ডও ব্যবহার করা যায়। এমনকি স্টাইলাসও ব্যবহার করা যায়। পুরো দেশটিকে কয়েকটি তথ্যসংগ্রহ অঞ্চলে ভাগ করে তাৎক্ষণিকভাবে পিডিএ/পামটপ বা স্মার্টফোন বা নোটবুকে সংগৃহিত তথ্য একটি কেন্দ্রিয় সার্ভারে আপলোড করা যায়। দেশের সর্বত্রই এখন মোবাইল নেটওয়ার্ক রয়েছে। ফলে মাঠে থেকেই কেন্দ্রিয় সার্ভারে ডাটা পাঠানো কোন কঠিন কাজ নয়। সিডিএমএ, জিপিআরএস বা ৩জি মোবাইল প্রযুক্তিতে এমন কি ভিডিও পাঠানোও কোন সমস্যা হবেনা।

আমি মনে করি, স্থানীয় ছাত্র-ছাত্রী, বেকার যুবক-যুবতী-শিক্ষিকা ইত্যাদি থেকে বাছাই করে কয়েক লক্ষ লোককে এ কাজে নিয়োজিত করা যায়। এক মাসের প্রশিক্ষণ এবং তিন মাসের মাঠকর্মের সাহায্যেই প্রাথমিক তথ্যাদি সংগৃহিত হতে পারে। এরপর যাচাই বাছাই করে পরিচয়পত্র ইস্যু করা যেতে পারে। তবে ডিজিটাল সংগ্রহ না করে তথ্যাবলি কাগজের ফরমের সাহায্যে সংগ্রহ করে কেন্দ্রিয়ভাবে ডাটা এন্ট্রিও করা যেতে পারে। নির্বাচন স্বচ্ছ করার জন্য ছবিসহ পরিচয়পত্রের বিকল্প নেই। সুতরাং নির্বাচনে ভোট জালিয়াতির একটি বড় ছিদ্র এর ফলে বন্ধ হয়ে যাবে। একই সাথে জাতীয় পরিচয়পত্র আইনশৃংখলা থেকে পাসপোর্ট পর্যন্ত সকল কাজেই ব্যবহৃত হতে পারে। এই একটি ডাটাবেজ সমগ্র জাতির পরিচিতি বহন করতে পারে। এরপর জন্ম নিবন্ধন-মৃত্যুর তথ্য আপগ্রেড

করলেই ডাটাবেজটি সবসময়েই ব্যবহার উপযোগী থাকবে। এতে বয়স হলেই ভোটার হবার স্বয়ংক্রিয় উপায় থাকতে পারে।

ক্রমান্বয়ে এই ডাটাবেজে আরো নতুন নতুন তথ্য যোগ করা যেতে পারে। যেমন পুলিশ বিভাগ এই ডাটাবেজে ক্রাইম রেকর্ড যোগ করতে পারে। বাংলাদেশ ব্যাংক ঋণ রেকর্ড যোগ করতে পারে। এই ডাটাবেজ থেকেই ভূমি রেকর্ড-স্বাস্থ্য রেকর্ড ইত্যাদি তথ্য পাওয়া যেতে পারে।

এই ডাটাবেজের সাধারণ তথ্য অনলাইনে থাকতে পারে। যে কেউ এই ডাটাবেজের তথ্য আপডেট বা সংশোধন করার জন্য অনলাইনে আবেদন করতে পারেন। তবে নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব থাকবে সেটি আপডেট করা।

প্রশ্ন উঠতে পারে, যে অতীতে এইসব চেষ্টা করা হলেও তা সফল হয়নি কেন? এক্ষেত্রে এটি স্মরণ করা যেতে পারে যে, নির্বাচন কমিশনের কর্তারা এই প্রকল্পটি ভিজুয়ালাইজই করতে পারেনি। তারা নিজেরা কিছু জানে না, যারা জানে তাদের সহায়তা তারা নেয় না। আমার স্মৃতিশক্তি যদি আমার সাথে প্রতারণা না করে তবে প্রথম যখন কম্পিউটারে ভোটার তালিকা মুদ্রণের প্রস্তাবনা পেশ করা হয়, তখনই এর সাথে বিশাল অঙ্কের ঘুষের সম্পর্ক ছিলো। এক ভদ্রলোক আমার তৎকালীন সেগুন বাগিচা অফিসে এসে আমাকে টাকার বিনিময়ে পুরো কাজ পাইয়ে দেবার প্রস্তাব করেছিলেন। তিনি নির্বাচন কমিশনের একজন বড় কর্তার আত্মীয় ছিলেন। আমার পক্ষ থেকে ঘুষ দেয়া হয়নি বলে ভোটার তালিকার কাজ এমনকি দু□শো বছরের প্রাচীন প্রযুক্তিতে প্রত্যাবর্তন করে।

পরবর্তীতে ভোটার তালিকা মুদ্রণ আর ভোটার পরিচয়পত্র নিয়ে এতোসব ঘটনা ঘটে যে, তা নিয়ে রীতিমতো থিসিস লেখা যায়। তবে এখন নির্বাচন কমিশন ভোটার তালিকা বা পরিচয়পত্র নিয়ে কি ভাবছে- তা আমরা জানিনা। রাজনীতিবিগদণও এ নিয়ে এখনো কোন কথা বলেননি।

অন্যদিকে, নির্বাচনে ভোট গণনার কারচুপি, সময়ক্ষেপণ ও জালিয়াতি প্রতিরোধের একটি বড় উপায় হলো কাগজের ব্যালট পেপারের সমান্তরাল উপায়ে ভোটিং মেশিনের প্রচলন করা। ভোট গ্রহণ, ভোটার সনাক্তকরণ, ভোটজাল, ভোটের সংখ্যা ও প্রাপ্তদের ভোটের হিসাব নিয়ে কখনোই সমন্বয় করা হয় না। ভোটার তালিকায় কারা আছে, কারা ভোট দিলো, কতো ব্যালট পেপার ব্যবহৃত হলো বা ফলাফলে কি প্রকাশ করা হলো, সকল পোলিং এজেন্টদের ভোটের হিসাব কি তা কখনোই মিলিয়ে দেখা হয় না। যদি তাই হতো তবে অনেক নির্বাচন বাতিল করতে হতো। ভোটিং মেশিন প্রচলিত হলে কেবল যে ভোটদান দ্রুত হবে তা নয়- ভোটপ্রদান শেষ হবার পর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ফলাফল ঘোষণা করা যাবে।

ব্যালটপেপার ছিনতাই, ভোটকেন্দ্র জবর দখল করা ইত্যাদি এর ফলে কমে আসতে পারে। অবশ্য ভোটিং মেশিন ছিনতাইতো হতেই পারে। তবুও একুশ শতকের প্রযুক্তি ব্যবহার করে ওয়্যারলেস নেটওয়ার্কিং জাতীয় ব্যবস্থা করে ভোটিং মেশিন ছিনতাইও প্রতিরোধ করা যায়।

কিন্তু নির্বাচন কমিশনতো দূরে থাক, আমাদের রাজনীতিকরাও এখনো ভাবছেন না যে, নির্বাচন ব্যবস্থায় কম্পিউটারায়ন খুবই জরুরী। তাছাড়া রাতারাতি যে এই ব্যবস্থা চালু করা যাবেনা এবং আগামী নির্বাচন যে খুবই কাছে তাও বোধ হয় কারো ভাবনায় নেই।

ভোটিং মেশিন এরই মাঝে ভারতেও চালু হয়েছে। এটি ভারতের মতো দেশে চলতে পারলে আমাদের দেশেও চালু করা সম্ভব। যদি ভোটিং মেশিনগুলোর তথ্য এবং অন্যান্য তথ্যের সমন্বয় করা হয় তবে নির্বাচন প্রক্রিয়ায় একটি জবাবদিহিতা তৈরী হবে। নির্বাচন প্রক্রিয়ায় একটি স্বচ্ছতা আসবে।

সঠিকভাবে পর্যালোচনা করলে এটি নিশ্চিত করেই বলা যাবে যে নির্বাচন প্রক্রিয়ায় তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করাটাই প্রাথমিকভাবে নির্বাচন সংক্রান্ত দুর্নীতি, অরাজকতা, ভোটকেন্দ্র দখল, জাল ভোট প্রদান ইত্যাদি বন্ধ করার সহায়ক হতে পারে।

আমরা একথা বলছি না যে, তত্ত্বাবধায়ক পদ্ধতির সংস্কার প্রয়োজন নেই। আমরা একথাও বলছিনা যে, নির্বাচন কমিশনের সংস্কার প্রয়োজন নেই। কিন্তু আমাদেরকে এটি বুঝতে হবে যে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার না করে শুধুমাত্র তত্ত্বাবধায়ক পদ্ধতির সরকার বা নির্বাচন কমিশন সংস্কার করলে নির্বাচন প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা বা জবাবদিহিতা আসবেনা। নির্বাচনে জাল ভোট একটি বিশাল জালিয়াতি। প্রচলিত পদ্ধতিতে জালভোট ঠেকানো প্রায় অসম্ভব। শুধুমাত্র ভোটের তালিকা দেখে ভোটার সনাক্ত করা মানুষের অসাধ্য। সুতরাং পরিচয়পত্র জাতীয় তথ্যপ্রযুক্তি ভোটিং মেশিন ইত্যাদি চালু করতেই হবে।

১৬ মে ২০০৫॥ ০৬ ফেব্রুয়ারি ০৬ সম্পাদিত